দেবী দুর্গার চালচিত্র

দীনবন্ধু আঢ্য

বছর দুই আগে মহাষ্টমীর সকালে আমার চার বছরের মেয়ের বায়না সামলাতে ঠাকুর দেখাতে বেরিয়েছিলাম। একটি মাঝারি, বারোয়ারি মণ্ডপে ঢুকেছি। প্রতিমা আমাদের দেখা অভ্যস্ত রীতির মূর্তি নয়। মণ্ডপটি জুড়ে আকাশ। মেঘের খেলা। সেই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এখানে সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সব মূর্তিগুলি বসানো।

নিদেনপক্ষে দুর্গা, সিংহ, মহিষাসুর—এরাও তিনজনে একত্র নয়। মহিষাসুর এক জায়গায়। দর্শকদের দিকে প্রায় পেছন ফিরে। দূর থেকে তার দিকে পাগলা কুকুর তেড়ে আসার মতো দেবীর বাহন সিংহ ছুটে আসছে। সিংহের কিছুটা পেছনে মা দুর্গা। অনেকটা কলকাতার আধুনিক অঞ্চলের আধুনিক মহিলারা যেমন নামীদামী কুকুর নিয়ে বিকেলে বেড়াতে বেরোন সেইরকম। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, মেঘনাদের মতো এক একটি মেঘের আড়ালে।

মূর্তিটি দেখে শিশুমনেও প্রতিক্রিয়া ঘটল। আমাকে প্রশ্ন করে, 'এ কেমন ঠাকুরগো বাবা'? উত্তর কী দেব ভাবছিলাম। প্রশ্ন যখন জেগেছে, উত্তর একটা খাড়া করতেই হবে। ঠিক আমাদের পিছনেই এক আশি ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধা প্রতিমা দেখছিলেন। খেয়াল করিনি। 'চুপ করো পরে বলছি'—বলে প্রসঙ্গটা এড়াবার চেষ্টা করছিলাম। পিছন থেকে বৃদ্ধা বললেন, 'চুপ করিয়ে দিলে চলবে কেন বাপু। কথাটা তো ঠিকই বলেছে। এ আবার কী ঢপের প্রতিমা। আসল কথা হল আমাদেরও আজ চালচুলো নেই। ঠাকুরেরও হয়েছে সেই দশা। আগে কেমন এক চালে মা থাকতেন। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। আর আজকাল। সব ভেন্ন ভেন্ন। আর হবে নাই বা কেন, তোমরা, আজকের ছেলেরা এতেই তো অভ্যস্ত। বাবা-মাকে ফেলে বউ নিয়ে যে যার সব ভেন্ন ভেন্ন সংসার।'

কথাটা মনে লাগে। তখন থেকেই মনের ভেতরে কিছু জিজ্ঞাসার চিহ্ন জড়ো হতে থাকে। চালচিত্র কী? আগে সব প্রতিমায় চালচিত্র থাকত, এখন সে চাল উঠে গেল কেন? কিন্তু বহুদিন সেই ভাবনা মনে বন্দি হয়েই ছিল। এতদিনে সেই ভাবনা বন্ধনমুক্ত হল।

বাড়ির পুজোর প্রতিমাতে এখনও চালচিত্র আছে। শুধু তাই নয়, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অদল-বদল কম-বেশি হলেও বাড়ির প্রতিমা এবং চালচিত্রের ক্ষেত্রে সাবেকি ভাবটা রাখার প্রচেষ্টা এখনও চলছে। বনেদি পরিবার নয়, অথচ মা লক্ষ্মীর আচমকা আগমনে কিছু কিছু পরিবার দুর্গোৎসব শুরু করেছে। তেমন ক্ষেত্রে খুব নগণ্য হলেও দেখেছি বাড়ির প্রতিমাও চালচিত্রহীন। এমনকি ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোতেও। তবে ব্যতিক্রম কোনও সময়েই আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাড়িতে আরাধ্যাদেবী চালচুলোহীন হননি। হয়েছেন বারোয়ারি পুজোয়। বারোয়ারি পুজোকে তো পুরনো লোকেরা বিধিসম্মত

পুজো বলেই মানতে চান না। যে কোনও পুজো করতে গেলে পূর্বাহ্নে সংকল্প করতে হয়। এবং এই সংকল্প হয় সাধারণভাবে গৃহকর্তার নামেই। কিন্তু বারোয়ারি পুজোয় তো আর কোনও একক কর্তা থাকেন না তাহলে সংকল্প হয় কার নামে! তার ওপর নানান আচার-অনুষ্ঠানের কথা তো আছেই। তবে এ প্রসঙ্গ থাক। কারণ এটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

বারোয়ারি পুজোর চাল খুব দীর্ঘদিনের নয়। তার আগে কেবলমাত্র বাড়িতেই পুজো হত। যে কারণে চালচিত্র ছাড়া প্রতিমার কল্পনা পুরনো মানুষেরা করতেই পারেন না।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে বারোয়ারি পুজোতে চালচিত্র বাদ দেওয়া হল কেন? অবশ্য ঠিক বাদ দেওয়া বলা চলে না। কারণ বারোয়ারি মণ্ডপেও প্রতিমার পেছনে এক ধরনের চালচিত্র থাকে। তবে সেটা পুরনো আমল থেকে চলে আসা প্রতিমার চালচিত্রের মতো নয়। এটা অনেকটাই 'ইমিটেশন'।

বারোয়ারি পুজোতে সাধারণত পুজোর মূল লক্ষ্যের থেকে চটকদারি প্রতিমা মণ্ডপ সাজসজ্জার দিকেই নজর থাকে বেশি। যে কারণে সবকিছুতেই নতুনত্ব, চমক ইত্যাদি দেখাতে গিয়েই পুরনো অনেক কিছু ভেঙে নতুন কিছু করার আগ্রহ থাকে। মোটামুটি এই কারণেই মনে হয় প্রতিমার এক কাঠামো বা সাবেকি চালচিত্র উঠে গেছে। তাছাড়া বারোয়ারি মণ্ডপে প্রতিমার আকার-আয়তনও বিরাট বিরাট করার ঝোঁক থাকায় এক কাঠামোয় দুর্গাঠাকুর করাও যথেষ্ট অসুবিধায়। বারোয়ারি তলায় শুধু প্রতিমার চালচিত্রই বদল হয়নি, বদল হয়েছে প্রতিমার রূপেরও। অবশ্য এটা শুধু বারোয়ারিওয়ালাদের ঘাড়ে চাপলেই হবে না। কালের বিবর্তনে বহু বাড়িতেও প্রতিমার রূপের বদল হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে সব সময় উদ্যোক্তাদের ইচ্ছাতেই যে হয়েছে তাও নয়। কুমোরের হাতবদলের বা দৃষ্টিকোণের তফাতেও এই রূপান্তর ঘটেছে।

শাস্ত্রে দুর্গার যে ধ্যানমন্ত্র নির্দিষ্ট করা আছে সেইভাবে যে রূপ কল্পনা করা হয়—সেই মূর্তিটি সর্বজনগৃহীত মূর্তি। এবং এই রীতিনীতিকে মেনে সম্ভবত দুর্গাপূজার প্রথম প্রচলন করেন তাহেরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ রায়। তবে এই কথা কিংবদন্তি অনুসারে। কোনও ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ এর সপক্ষে পাওয়া যায়নি।

প্রতিমা গঠনে দুটো রীতিই মোটামুটি মানা হয়। কংসনারায়ণী রীতি ও বিষ্ণুপুরী রীতি। আমরা যে প্রতিমা সাধারণভাবে বাড়ির পুজোয় দেখি সেটা হল কংসনারায়ণী রীতি। এই রীতি অনুসারে লক্ষ্মী, সরস্বতী থাকেন উপরে আর গণেশ-কার্তিক নিচে। কিন্তু বিষ্ণুপুরী রীতির প্রতিমায় ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। গণেশ-কার্তিক উপরে এবং লক্ষ্মী-সরস্বতী নিচে। এছাড়াও আর এক ধরনের প্রতিমা দেখা যায়। যাতে লক্ষ্মীর নিচে থাকে কার্তিক আর সরস্বতীর নিচে থাকে গণেশ।

তবে কংসনারায়ণী রীতিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির প্রতিমা এই রীতি অনুসারে নির্মিত। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে—এককালে কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতির প্রভাব

ছিল ব্যাপক। এবং বলতে গেলে এই পরিবারই দুর্গাপুজোকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

টানা টানা উঁচুতে তোলা চোখ, ভারি মুখ, চওড়া ভুরু, গোলগাল চেহারার, এক চালচিত্রে, এক কাঠামোতে বাড়ির যে ঠাকুর দেখে আমরা বলি বাংলা প্রতিমা, আসলে কিন্তু এটা বাংলা প্রতিমা নয়। একে বলে দোভাষী মূর্তি। আসল বাংলা মূর্তি এখন দেখাই যায় না বলা যায়। বাংলা মূর্তি কালক্রমে আকৃতির ভাঙাচোরা ও বিবর্তনে দোভাষী মূর্তিতে রূপান্তরিত করেন। গাল দুটি চোয়াড়ে। অনেকটা কাঠের খেলনা মূর্তির মতো। চিবুকটা চৌকো। ঠোঁট খুব পাতলা। নাক টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো। সরু সরু কান অবধি চোখ। ভুরু কানের সঙ্গে ঠেকানো। দোভাষী মূর্তিতে শিল্পীরা গালটা ভরাট করে দিলেন তো বটেই বরং বেশি মাত্রায় ভারি করে দিলেন। চিবুক হল সাধারণ। নাক করে দিলেন ঠিকালো সোজা। চোখ হল আয়ত। গড়ন পুঁটি মাছের মতো এবং আকর্ণ বিস্তৃত নয়। তবে সাজ উভয় ক্ষেত্রেই ডাকের। একই কাঠামোয় কিন্তু মূর্তির চোখ-মুখ-চেহারা মানুষের মতো—এমন প্রতিমা কুমোরের পরিভাষায় আধুনিক।

চালচিত্রের প্রসঙ্গে মূর্তির কথা কিছুটা বলতেই হল কারণ মূর্তি এবং চালচিত্র একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। চালচিত্রও প্রতিমার মতোই বিভিন্ন ধরনের। এবং এক এক বনেদি বাড়ির চালচিত্র এক এক রকম।

চালচিত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলাম কুমারটুলির নামী শিল্পী নিরঞ্জন পালের কাছে। বয়স সত্তর। তবে যথেষ্ট কর্মক্ষম। যদিও এখন আর তেমন কাজকর্ম করেন না। পড়াশোনা করেই সময় কাটান। ওঁর মতে চালচিত্র চার রকমের। বাংলা চাল, মার্কিনি চাল, মঠচৌরি চাল এবং টানাচৌরি চাল।

প্রতিমার দু পাশে দুটি থাম। সেখান থেকে অর্ধচন্দ্রাকারে যে চাল প্রতিমাকে শোভিত করে, তাকেই বলে মার্কিনি চাল। এই চালের নমুনা—বাগবাজার সর্বজনীন প্রতিমা। এবং অধিকাংশ বাড়ির প্রতিমাতেই এই চাল দেখা যায়। এককথায় এই চালই সর্বাধিক গৃহীত।

বাংলা চালে প্রতিমা দুপাশে মার্কিনি চালের মতো থাম থাকে না। অর্ধচন্দ্রাকৃতি না হয়ে প্রায় গোল এবং চালটি নিচের কাঠামো পর্যন্ত নেমে আসে। কোনও ক্ষেত্রে কাঠামো ছাড়িয়েও মেঝে পর্যন্ত এই চাল থাকে। এই চালের উদাহরণ শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ির প্রতিমা।

মঠচৌরি বা টানাচৌরি চালের চলন খুব কম। মঠচৌরি চালে প্রতিমার মাথায় প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে তিনটি খোপ থাকে। দেখতে অনেকটা জলের ঢেউয়ের মতো। এই তিনটি খোপের মাথায় থাকে তিনটি চুড়োর মতো। এই মঠচৌরি চালের নমুনা দেখার জন্য গিয়েছিলাম দর্জিপাড়ার মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে কনক মিত্রের বাড়ি। ৮৭ বছরের শক্তপোক্ত চেহারার কনক মিত্র জানালেন, তাঁদের মূর্তির চালেও কিছুটা পরিবর্তন আনতে বাধা হয়েছেন। সুতরাং যে প্রতিমা দিয়ে এই বাড়ির পুজো শুরু হয়েছিল সেই প্রতিমা আর পুরোপুরি দেখাতে পারবেন না। কারণ আর কিছুই নয়, সে জাতের শিল্পীর অভাব। এখন

আর কেউ সূক্ষ্ম কাজ করতে চায় না। বারোয়ারি প্রতিমা অনেক কম আয়াসে বেশি পয়সা দেয়। কাজেই সবারই ঝোঁক সেই দিকে।

এই ধরনের মূর্তি কলকাতার আরও কয়েকটি বনেদি বাড়িতে হয়। তবে পরিবার বিশেষে মূর্তি ও চালের ক্ষেত্রে অল্প কিছু ফারাক অনেক সময়েই থেকে যায়। যেমন একই ঢংয়ের মূর্তিতে কারও মাটির কাপড়, কারও সত্যিকারের কাপড়, আবার কারও পুরোমাত্রায় ডাকের সাজ। এই মূর্তিই পূজিত হয় হাটখোলার দত্ত বাড়ি, ছাতু বাবুর বাজারের কাছে রামদুলাল সরকারের বাড়ি, পাথুরেঘাটা স্ট্রিটের মন্মথনাথ ঘোষেদের বাড়ি এবং দর্জিপাড়ার দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ি।

মঠচৌরি চালে যেমন তিনটি খোপ থাকে টানাচৌরি চালে এই খোপ তিনটি থাকে না। থাকে একটি কার্নিশের মতো। এবং এর মাথায় থাকে গির্জার চুড়োর মতো তিনটি চুড়ো।

কুমোরটুলির বয়ঃজ্যেষ্ঠ তিন শিল্পী নীলমণি পাল, যতীন পাল ও হেমন্ত পালের খোঁজেও গিয়েছিলাম। এঁদের বয়স এখন ৯৮-৯৯ বছর। বেঁচে আছেন এঁরা ঠিকই কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই এখন এককালের নিজের গড়া মূর্তির মতোই নিশ্চল নির্বাক। ৭৮ বছর বয়সের সুরেন্দ্রনাথ পাল বা সুরেন পালের অবস্থাও প্রায় তাই। জড়িয়ে যাওয়া কথা, কিছু বুঝলাম। কিছুটা বোঝালেন ওনার ছেলে। সুরেন পালের থেকে আরও তিন চালের খবর পাওয়া গেল। যদিও এই চালের প্রচলন প্রায় বিলুপ্ত। কারণ এই ধরনের চাল তৈরির কারিগর আর এখন পাওয়া যায় না। চাল তিনটি হল গির্জে চাল, সর্বসুন্দরী চাল ও দোথাকি চাল।

ঠাকুরের পিছনে যেমন চাল থাকে, তেমনি সামনেও একটি চাল থাকত। প্রতিমা ওই দুটি চালের খোপের মধ্যে থাকতেন। একেই বল হত গির্জে চাল।

সর্বসুন্দরী চাল হচ্ছে অনেকটা গাড়ি বারান্দার মতো। কাঠামোর চার কোণে তিনটি করে মোট বারোটি থাম থাকত। এই থামের মাথায় সম্পূর্ণ ছাদের মতো চাল থাকত। অর্থাৎ এখন সে মূর্তি আমরা দেখি তার মাথা থাকে খোল। কিন্তু এই চালে মাথায় একটা আচ্ছাদন থাকত। তবে এই রীতির চাল সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত বলে জানালেন।

দেবীর চালচিত্রে নানান দেব দেবীর মূর্তি আঁকা থাকে। এ সবই চণ্ডী বর্ণিত ঘটনা। মধ্যে থাকেন শিব। এছাড়া আছেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। শুম্ভ, নিশুম্ভ বধের কাহিনিও আঁকা থাকে কোনও কোনও চালে। যদিও স্থান ভেদে, পরিবার ভেদে এই আঁকারও রকমফের আছে। তবে মূলত এই আঁকা সব চালচিত্রেই প্রায় একরকম। আগে মূর্তির চালে সরাসরি এই ছবি আঁকা হত। তবে এখন আর হয় না। কারণ ওই কাজ করার শিল্পী মেলে না। সমস্ত জগতের মতো মৃৎশিল্প জগতেও একই অবস্থা। সবাই চাইছেন সস্তায় বাজিমাত করতে। এই আঁকাগুলি এখন হয় কাগজের ওপর এবং সেই কাগজই সরাসরি চালে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এবং ওই আঁকাও কুমারটুলিতে হয় না। এই আঁকা হয় কেবলমাত্র কৃষ্ণনগরে। একে বলে পট। সেখান থেকেই পাইকাররা কিনে আনেন। যেমন আসে ডাকের সাজ। কুমারটুলিতে বহু

সাজের দোকান আছে। কিন্তু ডাকের সাজের জন্য এখনও কৃষ্ণনগরের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়। শুধু কুমারটুলিকে নয়, সারা বাংলাদেশকেই। সোলার সাজ ও কাজ মূলত কাটোয়াতেই হয়। তবে সোলার কাজ অবশ্য কুমারটুলি বা অন্যান্য জায়গাতেও হচ্ছে।

তবে চন্দননগরের কুণ্ডঘাটের কুমোরঘরে এখনও একজন বৃদ্ধ শিল্পী আছেন। বয়স আশির কাছে। তাঁকে ধেনোকাকু বা ধেনোদাদু বলেই সবাই ডাকে। তাঁকে দেখেছি চালচিত্রে সরাসরি ওই ছবি আঁকতে। এমনকি সন্ধ্যেবেলা কুপির আলো বাঁ হাতে ধরেও। সঠিক জানি না, তবু মনে হয় ওঁর পরের প্রজন্ম না হলেও তার পথের প্রজন্মকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হবে কৃষ্ণনগরের দিকেই।

শেষকালে একটা কথা না বললে অপূর্ণতার দায় ঘাড়ে নিতে হয়। তা হল আমার জানা অন্তত এখনও দুটি বারোয়ারি মণ্ডপে এক চালচিত্রে দুর্গা প্রতিমা পুজো হয়। বাগবাজার সর্বজনীন ও সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক বছরের জন্য এমন প্রতিমা কোনও কোনও বারোয়ারি মণ্ডপে পুজো করা হয়েছে—এমন নজির অবশ্য আছে। যেমন তালতলা অঞ্চলের তালতলা অ্যাভিনিউ সর্বজনীন পুজোয়।

তবে বাগবাজারে এখন যে ধরনের মূর্তি প্রচলিত তার কৃতিত্ব বহুলাংশেই প্রাপ্য নিরঞ্জন পালের। বাগবাজারে আগেও একই কাঠামোয় প্রতিমা হত ঠিকই, তবে তার চেহারা ছিল অন্যরকম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের আর্থিক অনটনে প্রতিমার পুরনো মেজাজ ও জাঁকজমক যখন বিলুপ্তপ্রায় তখন তৎকালীন বাগবাজার সর্বজনীন পুজোর কার্যকরী সমিতির সহযোগিতায় নিরঞ্জনবাবুই প্রতিমার সেই সাবেকি ঘরানার পুনরুজ্জীবন ঘটান। তবে নির্মাণ ভঙ্গিতে অবশ্যই কিছু রদবদল ঘটিয়েছিলেন।

শারদীয় পরিবর্তন, ১৩৯৬